ফ্রেন্ড, ফিলোজফার এবং গাইড
— কিছু গপ্পো, তক্কো আর যুক্তি

মেঘদূত রুদ্র

শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে সম্পাদক মহাশয়ের কাছ থেকে কাকতালীয়ভাবে অনুরোধ এলো যে ওঁদের এই বিশেষ সংখ্যার জন্য অধ্যাপক, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক, প্রবন্ধকার ও বর্তমান সময়ের অন্যতম চিন্তাবিদ শ্রী সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আমাকে কিছু লিখতে হবে। প্রস্তাবটা আমার কাছে খুবই লোভনীয় ও স্বস্তিদায়ক। কারণ শ্রী সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় আমার শিক্ষক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র বিদ্যা (Film Studies) বিভাগে এম. এ. পড়া এবং পরবর্তীকালে ওঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করার সুবাদে গত ১১ বছর ধরে আমি খুব কাছ থেকে ওঁর সান্নিধ্য পেয়েছি। শুধু সান্নিধ্য বললে কম বলা হবে। আরও অনেক কিছুই পেয়েছি। তবে শুধুমাত্র অধ্যাপক, চিন্তাবিদ ইত্যাদি গম্ভীর গম্ভীর বিশেষণে পাইনি। প্রাপ্তি তালিকায় এগুলো ছাপিয়ে আরও অতিরিক্ত অনেক কিছুই আছে। আর সেগুলোই এই প্রবন্ধে আমি লেখার চেষ্টা করব। কিছুটা ঋণমুক্ত হয়তো হতে পারব। ফলত সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে আমি মোটামুটি এককথাতেই রাজী হয়ে গেছিলাম। আর রাজী হয়েই পড়েছি মহা মুশকিলে! হাজার খানেক বা তার থেকে একটু বেশি শব্দের মধ্যে ওঁকে ধরাটা খুবই কঠিন। শুধু কঠিনই নয় অসম্ভব। যিনি প্রতি ঘণ্টায় হাজার খানেক কথা বলেন এবং যাঁর প্রায় প্রতিটি কথা কখনো হয়ে ওঠে সিনেমা, কখনো বা সাহিত্য, কখনো বা অনুপ্রেরণা আর কখনো বা নিছক মন ভাল করে তোলা কবিতা-তাঁকে এই স্বল্প পরিসরে কীভাবে ধরব জানিনা। স্বস্তিদায়ক ভাবে লিখতে রাজী তো হয়ে গেছিলাম কিন্তু লিখতে বসে ব্যাপারটা যে ক্রমশ সাংঘাতিক কঠিন হয়ে যাবে এটা আমার আগে থেকেই আঁচ করা উচিত ছিল। আমি নিশ্চিত যে এসব আদিখ্যেতা দেখলে সঞ্জয়দা বলতেন "বেশি পাকামো করোনা। নিজেকে রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন মহান লেখক ভাবাটা বন্ধ কর। যা লেখার চটপট লিখে ফেলো। তারপর পরের কাজটা কর"। যা ইচ্ছে তাই লেখার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় আর স্বাধীনতা যখন দিয়েই দিলেন তখন আর আমাকে আটকায় কোন হরিদাস পাল। তবে আমার তো একটু বেফাঁস বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস আছে। সেরকম কিছু বলে ফেললে না হয় আপনিই আটকে দেবেন"।

২০০৪ সালে যখন চলচ্চিত্র বিদ্যা বিভাগে এম. এ পড়বার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবার ঢুকলাম তখন না জানতাম যা বি নামটার মহত্ত্ব, না জানতাম চলচ্চিত্রের মানে, আর এও জানা ছিল না যে এলিট বুদ্ধিজীবী কীভাবে হতে হয় বা হওয়ার দরকারটাই বা কি?

আজও অবশ্য এই প্রশ্নগুলো মনে ঘুরপাক খায়। তবে তার কারণ গুলো পাল্টে গেছে। সে প্রসঙ্গ থাক। সিনেমা ভালবাসতাম আর ভবিষ্যতে সিনেমা বানাবো এরকম এক বুক স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। আর কোনো ধারণাই ছিল না। ওখানকার কোনো শিক্ষকেই চিনতাম না। সরকারি বাংলা মিডিয়াম স্কুল আর গ্রাজুয়েশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কমার্স) পড়ার ফলস্বরূপ ক্লাসে কোন পূর্ব-পরিচিত বন্ধুও ছিল না। যা সব পড়ানো হতো সেগুলো জীবনে প্রথমবার শুনছিলাম। ফলে একটা গভীর হীনমন্যতা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। পরে জেনেছিলাম অনেকেরই যা বি-তে এরকম হয়। যারা স্মার্ট তারা ম্যানেজ করে ফেলে আর যারা আমাদের মত তত স্মার্ট নয় তারা হয় চুপচাপ হয়ে যায় আর নইলে কোর্স ছেড়ে পালিয়ে-টালিয়ে গিয়ে মুক্তি পায়। আমাদেরও হয়তো এরকমই কিছু একটা করতে হত। যদি না বিভাগে সঞ্জয়দা থাকতেন। আমাদের মত শহরতলীর কলোনি, মফস্বল বা গ্রাম থেকে আসা আপাত আকাট ও আবোদা ছেলে-মেয়েদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন সঞ্জয়দা। মুগ্ধ হয়ে ওঁর পড়ানো শুনতাম। সব না বুঝলেও কথাগুলো প্রাণে নাড়া দিতো। তিনিই বুঝিয়েছিলেন সিনেমা বুঝতে বা বানাতে হলে ইংরাজি জানতে হয়না, ওভার স্মার্ট হতে হয়না, এলিট বুদ্ধিজীবী তো একেবারেই হতে হয়না। মরমিয়া হলেই চলে। প্রথম ৬ মাসের ওঁর এই লেকচারগুলো আজও আমাদের পাথেয়। তারপর আমরাও ম্যানেজ করতে শিখে নিয়েছিলাম মোটামুটি। চলচ্চিত্র শিক্ষা তো অনেকেই দিতে পারে কিন্তু জীবনের শিক্ষা এমনভাবে কয়জন দিতে পারেন? আর সেই পাণ্ডিত্যের মূল্যই বা কি আছে যা অনুজপ্রতিম ছাত্রদের মনোবল বাড়ানোর বদলে তাদের বিভ্রান্ত আর অসহায় করে দেয়? এই কথাগুলো ওঁকে অনেকবার বলার চেষ্টা করেছি। গুছিয়ে বলতে পারিনি। আজ সুযোগ পেয়ে প্রথমেই আমার কৃতজ্ঞতা আর প্রণাম জানিয়ে রাখলাম। ওঁর এই স্বভাবের জন্যই অর্ধেক বয়সি ছাত্রদের সাথে অচিরেই ওঁর একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছিল সেদিন। আজও হয় বলেই আমার ধারণা। একটা উদাহরণ দিই। ফাস্ট ইয়ারের শুরুর দিক। আমি তখন সিগারেট খেতাম না। কিন্তু বাকি বন্ধুদের অনেকে খেতো। একদিন মিলনদার ক্যান্টিনে সবাই বসে আড্ডা মারছি। সিগারেটও খাওয়া হচ্ছে। সেই সময় সঞ্জয়দাও ওখানে এসে উপস্থিত। ওঁকে দেখে সবাই তো সিগারেট লুকচ্ছে। উনিও সেটা দেখেছেন। এড়িয়ে যাওয়া বা রেগে যাওয়ার বদলে উনি সটান এসে আমাদের বললেন "দেখ বাবা এম. এ ক্লাসের মাস্টার হিসেবে আমার কাছে এটা চূড়ান্ত লজ্জার যে তোমরা আমাকে দেখে সিগারেট লুকচ্ছ। লুকিয়ো না।" এরকম তাজ্জব কথা আমি সেদিনের আগে পর্যন্ত কখনো শুনিনি। পরবর্তীকালে যখন সিগারেট খেতে শিখেছি তখন থেকে আজ পর্যন্ত ওঁর সামনে সিগারেট খেতে আমাদের কোনরকম ইতস্তত ভাব হয়নি। কমফোর্ট জোনটা উনিই দিয়েছিলেন। এর সঙ্গে বিশেষ টিকা-টিপ্পনীও ছিল "সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সেটা আলাদা কথা। কিন্তু খাচ্ছই যখন তখন আমার সামনেই খেয়ো। আর খাচ্ছ তো বাবার পয়সায়। আমার পয়সায় তো আর খাচ্ছ না"। প্রসঙ্গত বলে রাখি চল্লিশের পর উনি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতো অপোগণ্ডদের দৌলতে প্যাসিভ স্মোকিং-এর জ্বালা থেকে ভদ্রলোক আজও মুক্তি পেলেননা।

ওঁর সাথে আলোচনা করা যায় না এমন কোন বিষয় নেই। তার মানে এই নয় যে উনি সব জানেন। তবে ছাত্রদের সাথে সবকিছু নিয়ে কথা বলার বা আলোচনা করার উৎসাহ ওঁর আছে। খুব বেশি শিক্ষকের মধ্যে আমি এটা দেখিনি। বিশেষ করে বয়েসের পার্থক্য যখন অর্ধেক বা তারও বেশি হয়ে যায় তখন শিক্ষকরা মোটামুটি জ্যাঠামশাইয়ের ছেড়ে যাওয়া আসনটাই নিয়ে থাকেন। উনি সেই আসন নেননি। ওনার মধ্যে আজও একটা শিশুমন আছে। ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে মেলোড্রামার ব্যবহার কিভাবে ভারতীয় ছবির সংজ্ঞা বদলে দিয়েছিল থেকে শুরু করে ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সহ নারী শরীরের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স এরকম বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারে ওঁর সমান জ্ঞান ও আলোচনা করার উৎসাহ। নৈতিকতার দিক থেকে অনেকেই হয়ত অনেক কিছুকে বাঁকা চোখে দেখেন ও দেখবেন। কিন্তু জীবন ও সিনেমা যে এইসব নৈতিক মূল্যবোধের থেকে অনেক বড় সেটা উনিই শিখিয়েছেন। সিনেমায় আইজেনস্টাইনের মন্তাজ যেমন পবিত্র সেরকম সুচিত্রা সেনের বাঁকা চোখের চাহনিও পবিত্র, গোদারের জাম্প কাট টেকনিক যেমন যুগান্তকারী তেমন মেরেলিন মনরোর উরু ও স্তন-যুগলও যুগান্তকারী শিল্প। এগুলো ওনার সাথে আলোচনা করেই জানা যায়।

"এটা বেড়ে লিখেছো। তবে আর বেশিদূর এগিও না।"

আমি একবারও বলছিনা যে শুধুমাত্র ওঁর থেকেই জানা যায়। আরও অনেকেই হয়ত আছেন যারা অনেক কিছু জানেন এবং মানুষকে জ্ঞান প্রদান করে চলেছেন। কিন্তু সবকিছু নিয়ে সহজ সরল ভাবে কথা বলার মত লোক খুব বেশি আর পেলাম কই? এক ছিলেন মহাভারতের সঞ্জয়। যিনি যুদ্ধক্ষেত্রের সব খবর তার দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বলতেন। আর ইনি এযুগের সঞ্জয় যিনি বহু মানুষের দেখার চোখ তৈরি করছেন তার নিজস্ব কায়দায়।

"এবার বাড়াবাড়ি করছ। চেপে যাও"।

শুরুতেই শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম। উনি যে বড় লেখক ও প্রবন্ধকার সেটা আমি কিছুটা পরে জেনেছিলাম। পরে ওঁর লেখা চলচ্চিত্র বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়ে ওঁকে নতুনভাবে চিনেছিলাম। যেই সঞ্জয়দা ক্লাসে পড়ান বা করিডোরে আড্ডা মারেন তাঁর সাথে লেখক সঞ্জয়দার অনেকটা ফারাক আছে। উনি যেই ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষায় প্রবন্ধ লেখেন না। ওঁর সম্পর্কে প্রায়শই এই অবিযোগ ওঠে যে উনি খুবই দুরূহ ও লুপ্তপ্রায় ভাষায় লেখালেখি করেন। তাতে লেখার মারপ্যাঁচ নাকি বিষয়ের গুরুত্বকে ছাপিয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি সাহিত্যের ছাত্র নই। সিনেমার ছাত্র। কাজেই সাহিত্য সমালোচনা করার এলেম বা অভ্যাস দুটোর কোনটাই আমার নেই। কিন্তু ওঁর গুণমুগ্ধ পাঠক হিসেবে কয়েকটা কথা বলার আছে।

'জটিল বিষয় ধরেছ। সামলাতে পারবে তো? খামখা লোকজনকে রাগিয়ো না।'

ওঁর লেখাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে উনি কোন সময়ের প্রতিনিধি সেটা জানা একান্ত জরুরী। ৭০-এর দশকের উত্তাল সময়ে ছাত্রজীবন কাটানো সঞ্জয়দার লেখ্য ভাষা বাংলা সাহিত্যের এমন একটা সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছে যার অস্তিত্ব আজকের বাংলা সাহিত্যে

আর নেই। নবারুণ ভট্টাচার্য তাঁর লেখার মাধ্যমে সেই কাজটাই একটু অন্যভাবে করেছেন। ফলে সেই সময়কে না জানলে, সেই সময়ের সাহিত্যকে না জানলে সেই সময়ের কণ্ঠস্বরকে ধরা যাবে না। কেউ না জানতেই পারেন। জানতেই হবে এরকম কোন দাবিও নেই। আমিও সঠিকভাবে বলতে পারবোনা যে ওটা কোন সময়। তবে ফেলে আসা সময়ের সুর যে ওনার লেখায় বারবার ফিরে আসে এটা হলফ করে বলতে পারি। হয়ত টুকরো টুকরো সময়কে উনি মেলাতে চাইছেন। নতুন নতুন উপাদান, নতুন ব্যাকরণ যুক্ত হওয়ার ফলে যেকোনো ভাষাই সমৃদ্ধ হয়। সে সাহিত্যের ভাষাই হোক বা সিনেমার ভাষা। এটাই আধুনিক শিল্পের লক্ষণ। কিন্তু একইসাথে একটি আধুনিক ভাষার মর্যাদা তখনই অক্ষুণ্ণ থাকে যখন তার ইতিহাস সংরক্ষিত থাকে। আমরা তো কোন কিছুই সংরক্ষণ করিনা খুব একটা। ইতিহাসবিমুখ জাতি। কেউ কেউ করেন। উনি ওঁর মত করে ভাষার ইতিহাস সংরক্ষণ করছেন। মনে করিয়ে দিচ্ছেন কেমন ছিল এক সময়ের বাংলা ভাষা। এটুকু উপলব্ধি করার বোধ মনে হয় পাঠকদের থাকা দরকার।

"বাবা! থিসিসটা তো লিখছো না কিছুই। রোজই বল আজ দেবো কাল দেবো। আর এখানে এইসব বড় বড় দিচ্ছ। ভালই তো দিলে। এবার এটা শেষ করে তাড়াতাড়ি চ্যাপটার লিখে ফেলো।" (এ ব্যথা শুধু ভুক্তভোগীরাই জানে।)

বিখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্রের গোদার, রিভেত প্রভৃতিরা একসাথে মিলে ৫০-এর দশকের শেষের দিকে ফরাসি নব তরঙ্গ নামক একটি চলচ্চিত্র ভাষার জন্ম দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যা একটি চলচ্চিত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। একসাথে আন্দোলন করা ছাড়াও তাদের মধ্যে আরেকটি মিল ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই একজন কমন গুরু ছিলেন। আন্দ্রে বাঁজা। যাঁর শিক্ষা, অনুপ্রেরণা ও ভালবাসা এঁদেরকে মহৎ চলচ্চিত্রকার হতে সাহায্য করেছিল। স্বদেশে ঋত্বিক ঘটক এই একই কাজ করেছিলেন। পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউটে ডিরেক্টর থাকা কালীন (৬০-এর দশকে) উনি বেশ কিছু ছাত্রদের সিনেমা পড়িয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সেই ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ জন আব্রাহাম, মনি কাউল, কুমার সহানী, কে কে মহাজন, সুভাষ ঘাই ইত্যাদি হয়েছিলেন। যাঁরা গুরুর নাম রেখেছেন। বিভিন্ন সময় তাঁদের বক্তব্য থেকে জানা গেছিল যে শিক্ষক ঋত্বিক ঘটকই তাদের বুঝিয়েছিলেন সিনেমা কী। কীভাবে সিনেমা ভাবতে হয়। কিভাবে সিনেমা তৈরি হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। ঋত্বিক ঘটক নিজে ছবি বানাতেন। ফলে ছবি বানানোর সমস্ত দিক ছিল তার নখদর্পণে। এরকম ভাবে হয়ত আর কেউই জানত না। আর কেউ কোনদিনও জানবেও না। সেটা আলাদা প্রসঙ্গ। কিন্তু আন্দ্রে বাঁজা জীবনে কোনদিনও একটা শটও তোলেননি। সিনেমা বানানো তো অনেক পরের কথা। তা স্বত্বেও তাঁর ছাত্রদের সিনেমা পড়াতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। ছাত্রদেরও ছবি বানাতে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আমাদের অসুবিধা হল এই যে সঞ্জয়দার মত শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও আমরা এখন অবধি ওনার মান রাখতে পারলাম না। আমাদের বাজাঁ আছে কিন্তু কেউই গোদার হতে পারিনি। তবে অনেকেই চেষ্টা করছে। বিক্রমদা করছে, উৎসবদা করছে। আরও অনেকে করছে। আমার থেকে ছোটরাও করছে। উনি মাঝে 'রূপকলা কেন্দ্র' ফিল্ম ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ছিলেন।

সেখানকার অনেক ছাত্রও করছে। আরও অনেকেই আছেন যারা হয়ত ওনার প্রত্যক্ষ ছাত্র নয় কিন্তু ওনার সান্নিধ্য পেয়েছেন। তারাও করছেন। সময় পাল্টেছে। গোদার হতে না পারলেও হয়ত ভবিষ্যতে একদিন কিছু একটা হবে। নিশ্চয়ই হবে। কারণ আমরা জানি যেদিন দল বেধে আমরা সবাই ছবি বানাবো এবং চারিদিক থেকে বিভিন্ন সমালোচনা আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে থাকবে সেদিন একজন রক্ষাকর্তা আমাদের থাকবে, যিনি যাবতীয় বিরূপ সমালোচনা থেকে আমাদের সযত্নে আগলে রাখবেন। ভুল হলে শেখাবেন। কিন্তু মনোবল ভাঙতে দেবেন না। শুরুতেই বলেছিলাম সিনেমার শিক্ষক তো অনেকেই হয়, বোদ্ধাও অনেকেই হয় কিন্তু জীবনের শিক্ষক কয়জন হতে পারেন, যিনি ফালতু জ্ঞান না দিয়ে ভালবেসে ছোটদের জীবন বোধ তৈরি করতে সাহায্য করেন।

"অতিরিক্ত ইমোশনাল হওয়ার ফলে এই জায়গাটা ভাল করে লিখতে পারলে না। সেন্টেন্স কন্সট্রাকশন ঠিক নেই। তবে ইমোশনে মেরে দিয়েছো। দশে নয় দিলাম।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উনি পরীক্ষায় দারুণ নাম্বার দেন। দশে আট, দশে নয় এমনকি পারলে দশে দশ পর্যন্ত দিয়ে দেন। ওনার কথায় "বিশ্ববিদ্যালয়য়ে ছাত্রদের অনেক ক্লাস স্ট্রাগেল করতে হয়। তাই ওরা মার্ক্সবাদি। ওদের ভাল মার্ক্স দেয়াটা খুবই দরকার"। এজন্য মৈনাকদা (অধ্যাপক মৈনাক বিশ্বাস) মাঝে মাঝে রেগে যেতেন "ওরা কোন পড়াশোনা করেনা আর সঞ্জয়দা ওদের এতো নাম্বার দিয়ে যাচ্ছে। সব বখে যাবে। গোল্লায় যাবে"। এসব চলতেই থাকত। থাক সে কথা। ওঁর অসংখ্য গুণের কথা তো শুনলেন। আরও যেগুলো বলা হয়নি সেগুলো কমবেশি ওঁকে যারা চেনেন তারা সবাই জানেন। এক প্রবন্ধে তো আর সব জানা যায়না। বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তবে ওঁর বেশ কিছু দোষও আছে। তার মধ্যে এডিট-টেডিট করে না হয় কয়েকটা বলি।

"তোমার বৌদি সহ আমার অনেক স্নেহধন্যারা কিন্তু পড়বে। বুঝে সুঝে বল"।

ওঁর প্রধান দোষ হল ভুলে যাওয়া। বিভিন্ন জিনিস উনি বেবাক ভুলে যান। ওঁকে কোন বই বা কোন লেখা বা কোন জেরক্স নিয়ে আসতে বলাটা একটা বড়সড় বিড়ম্বনা। বারংবার ফোন, এস. এম. এস করে মনে করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও আসল দিনে উনি বইটা, লেখাটা, জেরক্সটা আনতে ভুলে যান। আমরা তো যথারীতি খুবই বিরক্ত হয়ে পড়ি। এতবার মনে করিয়ে দেয়া সত্বেও কিভাবে একটা লোক ভুলে যেতে পারে এইসব ভাবি। কঠিন পড়াকু ছাত্রছাত্রীরা তো বকাঝকাও করে ফেলে। উনি মিষ্টি মুখ করে ছাত্রীদের বকাঝকা খেয়েও নেন তারপর ওনার বাড়ির বা পাড়ার বা কোন এক চুলর কোন একজনকে জড়িয়ে একটা তুখড় গুল দেন। মানে যার জেরে উনি বইটা আনতে পারেনি আরকি। মানে আসল দোষটা ওনার নয়। যাকে নিয়ে গুলটা দেয়া হচ্ছে দোষটা আসলে সেই বেচারার। আমরাও গুলটা খেয়ে যাই। "আরে চিন্তা করোনা। কাল আসছ তো? কাল ঠিক নিয়ে আসবো"। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই কাল আর আসেনা। একবার একটা আস্ত চেক হারিয়ে ফেলে ডিপার্টমেন্ট সহ গোটা ফ্লোরের সবার জীবন উনি কয়েক ঘণ্টার জন্য অশান্তিতে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর সেই চেক ওনার ঘরের ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এবং খুঁজে পাওয়ার পরে স্বভাবতই উনি খুবই লজ্জিত হয়েছিলেন।

ভুলভাল ক্যাচাল পাকিয়ে তারপর দিনের শেষে লজ্জা ভাব করাটা ওনার সিগনেচার স্টাইল। বকাঝকা করেছেন (হাই প্রেশারের ফলে) ঠিক আছে, তারপর এতবার (সামনে দাঁড়িয়ে। সামনে না পেলে ফোন করে। ফোনে না পেলে এস. এম. এস করে। পারলে বাড়ি বয়ে গিয়ে।) সরি বলার কি আছে কে জানে? বাড়াবাড়ি করাটা বাঙালদের একটা কমন দোষ। তার ওপর ওনার মত বরিশালের হলে তো আর কথাই নেই। আমি নিজে বাঙাল বলে না হয় ব্যাপারটা বুঝি। বাকিরা বুঝবে কেন? যাই হোক দিন যায়, মাস যায়, বছর কাটে। আমরা যাদবপুরে একই রকম ভাবে থেকে যাই। জ্ঞান চর্চা, ইয়ার্কি-ফাজলামি সবকিছু নিয়েই চলতে থাকে আমাদের জীবন। ওঁর খুবই পছন্দের একটা বিষয় হল পরনিন্দা-পরচর্চা। এটাকে অবশ্য আমি খুব একটা দোষের মধ্যে ফেলিনা। যারা ফেলতে চান ফেলতে পারেন। সেরকমই ওনার অন্যতম অপছন্দের বিষয় হল কম্পিউটার বা ইন্টারনেটে কাজ করা। যে মানুষ আদতে একজন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (যাদবপুর থেকেই ভাল নাম্বার নিয়ে পাস করা।) বিভিন্ন ইলেকট্রনিক গেজেট ব্যবহারে তাঁর কীভাবে এত ভীতি আর অনীহা থাকতে পারে সেই ভাবনা আমাদের অবাক করে। একবার ক্লাসে ডিভিডি প্লেয়ার চলতে চলতে হঠাৎ সেটা আটকে যাওয়ায় উনি সেটা দেখতে গেছিলেন। তাতে ছাত্রীরা খুবই চিন্তায় পরে ওনাকে বলেছিল "সঞ্জয়দা হাত দেবেন না। শক-টক লেগে যেতে পারে"। তাতে উনি খুবই লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন "শোন মা, আমি না এককালে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছিলাম"। এমন নয় যে ওঁনার মায়েরা সেটা জানতো না। কিন্তু ওই হয়না, কোন কোন ছেলেকে দেখলেই মনে হয় যে ওই ব্যাটা মেশিনে হাত দিলেই শক খাবে। তার ওপর আবার মায়ের মন। বিশ্বাসই করতে পারেনা যে ছেলে ওটা ঠিক করতে পারবে। যথারীতি উনি পারেননি। অন্য একজন এসে ঠিক করে দিয়েছিল। সেই লোক বা অন্য কেউ এসে ওঁর প্রতি ক্লাসের শুরুতে প্লেয়ারটা চালিয়েও যেতো। কেন যে উনি হঠাৎ করে ওইদিন ওটা ঠিক করার উদ্দেশে ধাবিত হয়েছিলেন কে জানে! হয়ত ওঁর কোন প্রিয় ফিল্মের প্রিয় দৃশ্য দেখাচ্ছিলেন। যেটা আটকে যাওয়ার ফলে ওঁকে এরকম হটকারি সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। নইলে এরকম মেশিন ঠিক করার ঠিক করার জন্য এগিয়ে যেতে আমি ওঁকে আর কক্ষণও দেখিনি।

"বড্ড ফাজিল হয়েছো"।

ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে আজকাল চিঠিচাপাটি আসা অনেক কমে গেছে। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ চিঠিই মেইল-এ আসে। তাই নিরুপায় হয়ে ওনাকে মেইল আই ডি খুলতে হয়েছে। কিন্তু খুললে কি হবে। এখনও ইমেইলটা আমাদের দিয়েই চেক করান। উনি উত্তর বলে বলে দেন আর আমরা টাইপ করে পাঠাই। এবং আমি নিশ্চিত যে বাকি জীবনটা আমাদের মত চ্যালাদের দিয়েই মেইল চেক করিয়ে দিব্বি কাটিয়ে দেবেন।

"আরে আমার বয়েসি কজন বাঙালি নেট করতে জানে বলে তোমার মনে হয়? কেউই জানেনা। কিন্তু এমন ভাব দেখায় যেন সব জানে। আমি তো সেদিন একজনকে দেখলাম তার ভাইপোকে ফোন করে নিজের পাসওয়ার্ড জিগ্যেস করছে।"

এরকম অনবদ্য গল্প শোনার পর আমাদের আর কিছুই করার থাকেনা। বাঙালি

মধ্যবিত্তদের (বিশেষ করে কালীঘাটের বাঙালি) সঙ্গে ওঁর একধরণের দুষ্টু-মিষ্টি ব্যাপার আছে। সেগুলো নিয়ে ওঁর বিচিত্র সব গল্প আছে। লম্বা সিরিজ উনি লিখেছেন। অনেকেই সেগুলো পড়েছেন। খুবই অথেনটিক সব গল্প।

"আরে আসল ফ্যাক্ট শুনতে বাঙালিরা ইন্টারেস্টেড নয়। তার সাথে একটু ফিকশন না মেশালে লোকের ভাল লাগেনা"।

ঠিকই তো। এই কাজটাই তো সিনেমা যুগের পর যুগ ধরে করে আসছে। ফ্যাক্ট-এর সঙ্গে ফিকশনের সঠিক মেলবন্ধন যে করতে পেরেছে সেই তো ভাল ফিল্ম মেকার হতে পেরেছে। সে আলাদা প্রসঙ্গ। যেটা বলছিলাম। ইন্টারনেট না করলেও ওনার "প্রি গুগল ডাটাবেস" শুনে আমরা বেবাক হয়ে যাই। যেই ইনফো গুগল-ও দিতে পারেনা সেগুলো উনি অবলীলায় বলে দিতে পারেন। কলকাতার হ্যানো কোন বিখ্যাত-কুখ্যাত মানুষই নেই যার সম্পর্কে কোন না কোন গোপন খবর, হাঁড়ির খবর উনি জানেননা। তা সেই মানুষ ১০০ বছর আগেরই হোক কিম্বা আজকের উঠতি পাপীই হোক। এগুলো যদি উনি কোনদিনও লেখেন তাহলে বাংলা বাজারে প্রলয় লেগে যাবে বলেই আমার ধারণা। ওঁর জ্ঞান পরিধি কলকাতার বাইরেও বিস্তৃত। এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে কলকাতার বাইরে থাকলে তিনি বেঁচে যাবেন। আমরা নিশ্চিত যে এই গল্পগুলোর মধ্যে অনেকাংশ গুল থাকে। কিন্তু ওঁর মুখ থেকে শুনতে এতোই ভাল লাগে যে গল্পগুলোকে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয়। ওঁর ভাসনটা শোনার পর আসল ঘটনা শুনলে জোলো লাগে। কখনো সময় হলে ওঁর উৎপল দত্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখার্জী, শক্তি চট্টপাধ্যায়, মৃণাল সেন আর সত্যজিৎ রায় সহ অসংখ্য উপাখ্যানগুলো শুনে দেখতে পারেন। আজীবন মনে থাকবে। শুনতে চাইলেই উনি শুনিয়ে দেবেন। একই গল্প উনি বহু বছর ধরে বলে আসছেন। আর লোকে সেগুলো শুনে আসছে। পুরনো বা একঘেয়ে লাগছে না। রেডিওতে অনুরোধের আসরে হেমন্ত, মান্না, শ্যামল বা গীতা দত্তের গানের মত। বারবার শুনলেও আবার শুনতে ইচ্ছে করে।

ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক অনেক রকম হয়। গুরুর মত, জ্যাঠামশাইয়ের মত, বাবার মত, দাদার মত আবার কখনও বন্ধুর মত। উনি এই সব কটার ককটেইল। প্রকৃত অর্থেই ছাত্রদের ফ্রেন্ড, ফিলোজফার আর গাইড। জ্ঞানবৃদ্ধ উনি কোনদিনও হবেন না। তাজা-তরুণ বন্ধুটিই থেকে যাবেন বলে আমার ধারণা। এরকম ছাত্র-দরদী শিক্ষক আমি আমার জীবনে দেখিনি।